Vol. 34 | No. 2 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দুটি উপন্যাস: প্রসঙ্গ বিপ্লব

Volume	34
Issue	2
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	স্বপ্না রায়
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i2.7
Pages	167-182
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

দুটি উপন্যাস: প্রসঙ্গ বিপ্লব

স্বপ্না রায়

১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল, অর্থাৎ এক বিশ্বযুদ্ধ থেকে অন্য বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময় উপমহাদেশের এক যুগান্তকারী কালপরিসর। আর তা যেমন রাজনৈতিক কারণে, তেমনি অর্থনৈতিক কারণে। উপনিবেশ–শৃঙ্খলিত ভারত উপমহাদেশ তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ–পরোক্ষ যুগধর্মশাসিত গণমানসে এবং সাহিত্যে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে,ইংল্যান্ডের সংকটলগ্নে ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে সহযোগিতা দান করেছিল। কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছিল— স্বরাজপ্রদানের অঙ্গীকার ভঙ্গ (১৯১৮), মন্টেগু–চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা (১৯১৯), দমননীতিমূলক রাউলাট আইন (১৯১৯), জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড (১৯১৯)। এ–ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতায় নিঃসন্দেহে প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল দেশবাসীর। গান্ধীজীর নেতৃত্বের ধ্বজাতলে দাঁড়িয়ে তাই সঞ্জীবিত বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০)। অবশ্য এ–আন্দোলন নানা কারণে এককভাবে সংঘটিত না হয়ে অহিংস ও সহিংস—এ দু'টি ধারায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল স্বল্পসময়ের মধ্যেই। চৌরিচৌরায় থানা আক্রমণ (১৯২২), প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারত আগমনের দিনে বোম্বাইয়ে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান, মোপলাদের বিদ্রোহ, বাংলায় ও যুক্তপ্রদেশে সশস্ত্র কৃষকবিদ্রোহ প্রভৃতি[১] এর সাক্ষী।

দেশ যখন এমনি পরিস্থিতির জোয়ারে প্রতিবাদ–তরঙ্গিত, রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১–১৯৪১) তখন বিশ্ববন্দিত এক প্রবাদপুরুষ, অনন্যসাধারণ শিল্পব্যক্তিত্ব। তাঁর শিল্পকৃতিত্বের অসামান্য নমুনা সাহিত্যের বিচিত্ররাজ্যে তখন ব্যাপকবিস্তৃত। দেশব্যাপী এমনকি গোটা বিশ্বপ্লাবী এই ভাঙাগড়ার প্রভাব এবং এই প্রভাবজনিত আলোড়ন বিভিন্ন পর্যায়ের রচনার মত তাঁর

কোন কোন উপন্যাসকেও স্পর্শ করেছিল। সাহিত্যরাজ্যে উপন্যাস নিঃসন্দেহে একটি বাস্তব জীবন সন্নিহিত শিল্পমাধ্যম। তাই দেশকালের বিচিত্র প্রবণতার ছায়া প্রতিফলিত হয় এর অবয়বে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এর ব্যতিক্রম নয়। এ পর্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে আমরা পাই তাঁর "ঘরে বাইরে" (১৯১৬) ও "চার অধ্যায়" (১৯৩৪)। সন্ত্রাসী বিপ্লব সম্পর্কিত বক্তব্যও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে।

শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬–১৯৩৮) রচনায়ও দেখি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের স্বাক্ষর বহন করে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস "পথের দাবী" (১৯২৬)।

চিন্তায় ও আদর্শে এ দু'ধারার দুই শিল্প স্রষ্টার ভিন্ন পথযাত্রীদের একজন নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬)। তাঁর "বাঁধনহারা" (১৯২৭), "মৃত্যুক্ষুধা" (১৯৩০) ও "কুহেলিকা" (১৯৩১)— তিনটি উপন্যাসই ব্রিটিশ–বিরোধী আন্দোলনের বক্তব্যে পরিপূর্ণ।

উপন্যাসে রাজনৈতিক আন্দোলন ও ইংরেজ শাসনের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শনের আয়োজনের পূর্বাভাস বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮–১৮৯৪) থেকেই সূচিত হয়েছে। তাঁর "চন্দ্রশেখর" (১৮৭৫) ও "আনন্দ মঠ" (১৮৮২) উপন্যাসে এর প্রমাণ রয়েছে। এ পর্যায়ের রচনায় স্বদেশ, স্বজাতি বিশেষতঃ স্বধর্ম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বেশী। রবীন্দ্রানাথে এসেছে শৃংখল মোচনের প্রয়াসে আন্দোলনের কথা। তার মধ্যে সন্ত্রাসী বিপ্লব সম্পর্কিত বক্তব্য থাকলেও তিনি সন্ত্রাসের বিভীষিকাময় ও চরম পথকে কখনোই সমর্থন করেননি। শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"তে 'ভারতের মুক্তিকামী অশান্ত যুবক হৃদয় যে পরাধীনতার লৌহশৃংখলের জ্বালায় কতটা অধীর হয়ে মুক্তির পথ খুঁজতে পাষাণে মাথা খুঁড়ে মরছিল— সেই পথ খোঁজার প্রয়াস— আমারা পাই।'[২] সে পথে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবিরোধিতার পক্ষে বা বিপক্ষে সরাসরি কোন মন্তব্য তিনি উপস্থিত করেননি। নজরুলেও পাই এমনি আন্দোলনের মন্ত্র বুকে নিয়ে ত্যাগের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ার আয়োজন।

উপমহাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় সৃষ্ট সাম্প্রতিক জীবনবোধ, চিন্তা–চেতনা ও চরিত্রগত বিচারের জন্য দুই অনিন্দ্য স্রষ্টার দু'টি উপন্যাসকে এই নিবন্ধের পরিসরে নির্বাচন করা হয়েছে। এক. শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী", দুই. নজরুল ইসলামের "মৃত্যুক্ষুধা"। উপন্যাসের ক্ষেত্রে শরৎ–নজরুলের

তুলনামূলক আলোচনা পাঠককে হয়ত এক অনতিক্রম্য অস্বস্তির সম্মুখীন করবে। কিন্তু উপন্যাস দু'টিতে বিষয়বস্তুগত, চরিত্রগত, নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবন–চিত্রায়ণগত, সর্বোপরি লেখক দু'জনের জীবনদর্শনগত সামঞ্জস্য লক্ষ করার বিষয়।

শরৎ সাহিত্য তার স্রষ্টার 'সহানুভূতিশীল প্রেম, করুণাপূর্ণ এক অপূর্বনিবিড় অতলান্ত অনুভূতি'র প্রকাশ। সাহিত্য স্রষ্টার বেদনা এবং সেই বেদনাপ্রসূত উপলব্ধ সত্য তাই তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলোর পরতে পরতে বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে। এ উপলব্ধ সত্যের প্রকাশ তার রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী'তেও রয়েছে, কিন্তু তা এসেছে ভিন্ন আঙ্গিক ও বিষয়কে আশ্রয় করে।

উপন্যাসের যে পটভূমি তার উৎস, বিকাশ এবং পরিণতি ভারতবর্ষের বাইরে, সুদূর বর্মামুলুকে। দেশের মাটিতে রক্ষণশীল মায়ের আদর্শ পুত্র অপূর্বকে দিয়ে উপন্যাস শুরু হলেও এর মূল কাহিনী প্রাণলাভ করেছে অনেক পরে, বর্মায় সে 'পথের দাবী সমিতি'র সভ্যপদলাভ করার পর। দেহবর্ণে ও অস্তিত্বে ভারতীয় হবার অপরাধে একাধিকবার লাঞ্ছিত হবার ঘটনা তার স্বদেশী চেতনাসমৃদ্ধ হৃদয়কে আক্রান্ত করেছিল বর্মায় পা দেবার শুরু থেকেই। এরপর অপমানকারী যোশেফ সাহেব ও তার স্ত্রীর মৃত্যু, অপূর্বর অবর্তমানে যোশেফ–কন্যা ভারতীর সেবায় তার বসন্ত রোগাক্রান্ত গৃহভৃত্যের প্রাণ রক্ষা ইত্যাদি ঘটনা অপূর্বকে ভারতীর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তারই সহযোগিতা ও আগ্রহে 'পথের দাবী'র সভ্যপদলাভ করে সে। ভারতীর সঙ্গে কারখানার মজুর–মিস্ত্রীদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের অমানবেতর জীবনযাত্রা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে, উপলব্ধি করে মালিকশ্রেণীর শোষণের স্বরূপ। তারপর ফয়ার মাঠে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাদানের সুযোগ ও সভানেত্রীর প্রশংসা লাভ, পরবর্তী পর্যায়ে পুলিশের হাতে পড়ে সমিতির খবরাদি ফাঁস ও বন্ধু ব্যক্তি রামদাস তলোয়ারকরকে ফাঁসিয়ে দিয়ে চাকুরি ও নিজেকে বাঁচানো, সমিতির তরফ থেকে তার মৃত্যুদণ্ডের দাবী কিন্তু সব্যসাচী কর্তৃক অপূর্বর প্রাণ রক্ষা, দেশে প্রত্যাবর্তন, অসুস্থ মায়ের কারণে আবার ফিরে আসা, মায়ের মৃত্যু ও মৃত্যুজনিত বৈরাগ্যে কৃষকদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিসমাপ্তি লাভ করে।

উপন্যাসের কাহিনী মোটামুটি এই হলেও লেখকের মৌল বক্তব্য নিহিত রয়েছে অপূর্বর দেশে যাওয়া এবং ফিরে আসার মধ্যবর্তী সময়ে ভারতী আর সব্যসাচীর কথোপকথনের মধ্যে। ভারতী আর সব্যসাচী এ উপন্যাসের দু'টি প্রধান চরিত্র। ভিন্ন দু'টি মত ও দু'টি পথের প্রতীক। তারা দু'জন লেখকের আদর্শগত দু'টি প্রশ্নের প্রতিনিধিস্বরূপ। ভারতের মুক্তির কোন্‌টা পথ? সন্ত্রাস না অহিংসা? ভারতীর বক্তব্য: "রক্তপাতের জবাব যদি রক্তপাতই হয়, তাহলে তারও জবাব রক্তপাত এবং তারও জবাবে রক্তপাত ছাড়া আর কিছু মেলে না"[৪] কিন্তু সব্যসাচীর বক্তব্য এই যে, অশান্তি আর অকল্যাণ এক কথা নয়। তাছাড়া বিপ্লবের হাত ধরেই তো আসবে শান্তি। এ বিশ্বাস আমরা নজরুল-চেতনায়ও প্রত্যক্ষ করি। তাঁর সৃষ্টির শিল্প প্রতিমা ধ্বংসের দেবতা, ক্ষ্যাপা নটরাজ, যাঁর জটিল জটাশীর্ষে বিকাশোন্মুখ শিশু চাঁদের অবস্থান।

শরৎচন্দ্র এখানে সরাসরি কোন মতামত উপস্থিত না করলেও এটা সত্য যে, সন্ত্রাসবাদী নেতা সব্যসাচী শরৎ-চেতনার আদর্শপুরুষ। যে তার নিজের সম্পর্কে বলে "আমার বুকের আগুন নেভে শুধু দুটো জিনিস দিয়ে। এক· নিজের চিতাভস্মে, আর যেদিন শুনবো ইউরোপের ধর্ম, সভ্যতা, নীতি সমুদ্রের অতলজলে ডুবেছে।"(পৃ ১২৩৯) বিপ্লব সম্পর্কে তার মত হল- সত্যিকারের শান্তি পথ রুদ্ধ বলেই তো সে পথ খোলার প্রচেষ্টা রূঢ়। বিপ্লবের রাজপথে শক্তির পরীক্ষা দিতে না পারলে সত্য ধরা দেয় না, শান্তিও এগোয় না। তাইতো বিপ্লব এবং তার অনিবার্য সহযোগী হিংসা ও রক্তপাত। এভাবেই লক্ষ্য অর্জন করেছে হাঙ্গেরী, রুশিয়া। এমনকি জাপানও এর ব্যতিক্রম নয়।

নিজের জীবন ও হৃদয়বৃত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ এ মানুষটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভারতীর ভাষ্যে: 'মান অভিমান নেই, দয়ামায়া নেই, বুকের ভেতরটা একেবারে পাষাণ দিয়ে গড়া— সেই পাষাণ স্তূপের মধ্যে আছে শুধু একটি বস্তু—জননী জন্মভূমি।' (পৃ. ১২০৫) আরও স্পষ্টতা পায় সব্যসাচী সম্পর্কে সুমিত্রা প্রযুক্ত উপমায়: বর্মা অয়েল কোম্পানীর কারখানা ঘরের কালো পাহাড়ের মত যা জড়পিণ্ডের অধিক আর কিছুই নয়, কিন্তু গর্ভে তার অগ্নির প্লাবন, যা গোটা পৃথিবীটাকেও নিমেষে ভস্মস্যাৎ করে দিতে পারে অথচ বাইরে শান্ত জড়পিন্ড, ভিতরের লেশমাত্র প্রকাশ বাইরে নেই। এই যন্ত্রটিকে সুমিত্রা যখন সব্যসাচারীর উপমা হিসেবে ব্যবহার করে বলে: 'এই ভয়ানক

যন্ত্রটাকে মনে রেখো ভারতী, তোমাদের ডাক্তার বাবুকে চিনতে পারবে। এই তাঁর সত্যকার প্রতিমূর্তি।' (পৃ. ১২০৫) তখন তার পরিচয় আরও স্পষ্টতা পায়।

পৃথিবীর অনেকগুলো ভাষায় অধিকার, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, অপরিসীম শক্তি ও সাহস সব কিছুই তার অসাধারণ। অপূর্ব তার ছদ্মবেশ ধারণ ক্ষমতা। দেশ-বিদেশে সর্বত্র তার গুপ্ত সমিতি। অহিংস নীতির বিপরীতে কাজ করে যাওয়া বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আধার এই চরিত্রটি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা এবং কোন কোন অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অপরিসীম নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, চরিত্রবল, ত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির আমোঘ মন্ত্র যাদের বুকের গভীরে ছিল সদা সক্রিয়। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গী শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য লক্ষণীয়:

> কয়েকজন বিপ্লবী নেতার জীবনের ছায়া বিশেষ করে সব্যসাচী চরিত্রে পড়েছে। দুর্জয় সাহস, অসাধারণ শারীরিক শক্তি, অসীম স্নেহপ্রবণতা ও ক্ষমাশীলতা— এই গুলি নিয়েছেন যতীন মুখার্জীর জীবন থেকে, ছদ্মবেশ ধারণের অসাধারণ নিপুণতা ও গিরিশ মহাপাত্ররূপী সব্যসাচীর খুঁড়িয়ে চলা নিয়েছেন ড. যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জীবন থেকে, পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে বেড়ান ও বৈপ্লবিক কেন্দ্র সংগঠনের দিকটা নিয়েছে রাসবিহারী বসু ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জীবন থেকে, নানা দেশের ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের ব্যাপারটা নিয়েছেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তারকনাথ দাস প্রভৃতির জীবন থেকে, দুই হাতে অব্যর্থ লক্ষ্যে রিভলভার ছোঁড়ার দক্ষতার মধ্যে সতীশ চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজনের ছাপ আছে।····· নিছক কল্পনা দিয়ে তিনি সব্যসাচী চরিত্রের একটি আঁচড়ও টানেননি।'[৫]

এঁদেরই যোগফল মানস-চেতনায় ধারণ করে শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন এই সব্যসাচী চরিত্র। উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকাকে সরাসরি স্বীকৃতি না দিলেও ভারতীর উক্তিতে অহিংসবাদের যে বক্তব্য তিনি তুলে ধরেছেন তা নারীত্বের কোমলতায় মধুর, অনুরোধ আকৃতিতে পূর্ণতর, কিন্তু প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় দৃঢ় নয়। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে বিদেশী শাসকের পদতলে পিষ্ট-দলিত আহত শরৎ-মানস এর বিপরীত পথটিকেই সমর্থন দিয়েছিল। ফাঁসি, দ্বীপান্তর আর অবর্ণনীয় নির্যাতনের পথযাত্রী 'বাংলার মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের মমত্ববোধ ছিল সর্বজনবিদিত। এ কারণে নিজের

লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক এবং পিস্তল দুই-ই সেদিন তাঁকে হারাতে হয়েছিল সরকারীনির্দেশে।[৬] গান্ধীজীর অহিংস নীতি বিশেষতঃ চরকানীতি তাঁর সমর্থন পায়নি। তাই—"But why don't you believe that the attaimnent of Swaraj will be helped by Spinning?" গান্ধীজীর এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন: "I think attainment of Swaraj can only be helped by Slodiers and not by Spiders."[৭]

এ উপন্যাসের সামাজিক তাৎপর্য যেটুকু রয়েছে তা বাদ দিলে 'পথের দাবী' পুরোপুরি রাজনৈতিক বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত। তাই নিছক শিল্পের মানদণ্ডে নয়, বরং রাজনৈতিক নিরিখে এর ঔপন্যাসিক তাৎপর্যের বিচার হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এ বিচারে চরিত্রের প্রসঙ্গ আসে। শরৎচন্দ্র এখানে তিনটি প্রতীক চরিত্র অঙ্কন করেছেন—সব্যসাচী, ভারতী ও অপূর্ব। এরা যেহেতু তিনটি মত ও চিন্তার প্রতিফলন, তাই ঔপন্যাসিক চরিত্র-বিশ্লেষণের পর্যায়ে এদের না ফেলাই বাঞ্ছনীয়।

ক. শরৎচন্দ্র কথাশিল্পী হলেও রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগাযোগ। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তাই বিপ্লবের বিসর্পিল পথে বিচরণ না করেও একটা বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তিনি একাত্মতা পোষণ করতেন। সেই একাত্ম-সমর্থনেরই প্রত্যক্ষ ফল ''পথের দাবী'' উপন্যাসের সব্যসাচী চরিত্র। যার চিন্তায় ও কর্মে দেশোদ্ধারের অটল সংকল্প। ইংরেজ শাসনের প্রতি পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা। এ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাপ্রসূত উক্তি-প্রত্যুক্তি সব্যসাচীর অর্থাৎ লেখকেরই ব্যক্তিগত ব্যাপক অভিজ্ঞতার ফল। ইংরেজ বিদ্বেষের বিসুভিয়াস বুকে ধারণ করে রেখেছিল বলেই ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দকে বিপ্লবের চেয়ে বড় বলে উল্লেখ করলেও উপন্যাসে তাকে দেখা যায় সন্ত্রাসী বিপ্লবের পথ পর্যটনে এক দুরন্ত পথিকরূপে।

খ. সমগ্র উপন্যাসে যে দুটো মতবাদের দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত হয়েছে—ভারতী তার একটির প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র। ভারতীর বেনামে উল্লেখিত গান্ধীজীর অহিংস নীতি অবশ্যই শরৎ-সমর্থিত মতের সঙ্গে মেলে না, তবু মমতাময়ী কল্যাণ-লক্ষ্মীর প্রতীক ভারতীকে, ভারতীর অহিংস, মানবধর্মের মতামতকে তিনি অস্বীকারে উড়িয়ে দেননি, হীন-প্রতিপন্ন করেও প্রদর্শন করেননি।

সহনশীলতার নিরিখে তুলনামূলক বিচারের আদর্শই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এ উপন্যাসের পরিসরে।

গ. অপূর্ব বাঙালী সমাজের সেই শ্রেণীর চরিত্র যারা সংসারের নিশ্চিন্ত কুসুম শয্যায়, সাধারণ মানুষের জীবন ও অবস্থা থেকে দূরে গা বাঁচিয়ে অবস্থান করে দেশোদ্ধারের রোমান্টিক স্বপ্ন রচনায় অভ্যস্ত। কিন্তু প্রয়োজনের চরম মুহূর্তটির মুখোমুখি হলে তাদের আদর্শের সবটুকু আয়োজন নস্যি হয়ে উবে যায়। শুধু তাই নয়, আরামে লালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্বলচিত্ত এই বিপ্লবীরা সত্যিকার বিপ্লবের আয়োজনকে বিপন্ন করে তোলে। অপূর্ব সেই অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্ত বাঙালী মানসাশ্রয়ীদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে এখানে।

তাছাড়া রয়েছে সুমিত্রা, শশী, রামদাস তলোয়ারকর, তেওয়ারী, হীরা সিং, ব্রজেন্দ্র, কৃষ্ণআইয়ার প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্র। তারা স্বল্প রেখায় চিহ্নিত হয়েও উপন্যাসের চকিত বিদ্যুতাভায় নিজস্বক্ষেত্র অনুযায়ী কেউই অস্পষ্ট আভাসে আচ্ছন্ন থাকেনি। যদিও এদের কারো কারো চরিত্রের সম্ভাবনাময় দিককে উপন্যাসের পরিসরে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে মনযোগী হননি লেখক।

রাজনৈতিক উপযোগিতায় লেখকের জীবনদর্শন রূপলাভ করেছে উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে সব্যসাচীর বক্তব্যে:

ক. সাপ বিলাত থেকে আসেনি দিদি– তাদের ধর্মজ্ঞান আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না। (পৃ.১২২৬)

খ. ও কবি, ও গুণী, ওদের জাত আলাদা। ওদের ভালমন্দ ঠিক আমাদের সাথে মেলে না। (পৃ.১২২৫)

গ. বিপ্লব মানেই শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়, বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন। (পৃ. ১২৪৬)

ঘ. মানুষ সত্তর বছরের প্রাচীন হয়েছে বলেই দশ বছরের শিশুর চেয়ে বেশী পবিত্র হয়ে ওঠে না। .... ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম ... তাকেই আজ পবিত্র মনে করে কে জানো ভারতী? ব্রাহ্মণ! চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয় পবিত্রজ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার! .... সমস্ত ধর্মই মিথ্যা,— আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এতবড় পরমশত্রু আর নেই! (পৃ.১২৪৯-৫০)

ঙ. স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ কথা নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ— এরা আরও বড়। এদের বিকাশের জন্যই ত স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা? (পৃ. ১২৩৬)

চ. শান্তির পথ ঐ সনাতন, পবিত্র ও সুপ্রাচীন সভ্যতার সংস্কার দিয়ে এঁটে বন্ধ করা আছে · · · । কেবল ঐ বিপ্লবের পথটাই আজও খোলা আছে। (পৃ ১২৩৩)

একটি উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি অনেক সময়েই শৈল্পিক নির্মাণাদর্শের নিখুঁত বিন্যাস দাবী করতে পারে না। কল্পনা–সমৃদ্ধি, মতাদর্শ সংস্থাপন ও জীবনদর্শনের রূপায়ণে সার্থক হলেও তাই শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' এ ত্রুটির ব্যতিক্রম নয়। কাহিনীর কাঠামো বিচারে উপন্যাসের দু'টি পর্ব স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ অপূর্ব ভারতীয় আকর্ষণ ও আকর্ষণজনিত আচরণের শৈল্পিক রূপায়ণ, দ্বিতীয়তঃ এর কেন্দ্রীয় চরিত্র—সব্যসাচীর বিপ্লবী মতাদর্শ ও বিপ্লবাত্মক অতীত কার্যাবলীর বিবরণ। সব্যসাচীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের নায়ক একেবারেই গৌণ হয়ে পড়েছে এবং শেষ অবধি সব্যসাচীই একমাত্র আকর্ষণীয় চরিত্র রূপে অবস্থান করেছে। অথচ বিপ্লবী কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও সব্যসাচীর পাশাপাশি অপূর্ব চরিত্রটিকে ধরে রাখা হয়েছে।

সব্যসাচী এই কাহিনীর নায়ক, কিন্তু এই নায়কের বিপ্লবী জীবনের কোন ঘটনাই এখানে কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়। 'এই অত্যাশ্চর্য মানুষটির ততোধিক আশ্চর্য হৃদয়ের রহস্যাবৃত তলদেশে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ'[৭] চমকে যায়। দামাল কিশোর শৈলর (সব্যসাচী) জাঠতুতো দাদার মৃত্যুর ঘটনা ও মৃত্যুকালীন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার জীবনে বিপ্লবের বীজ উপ্ত হবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিটি বাক্যে, প্রতি পদক্ষেপে তার অসংখ্য বিস্ময়কর অতীত কার্যাবলীর ব্যঞ্জনাও এখানে ফুটে উঠেছে। কিন্তু নায়কের বিপ্লবী জীবনের ধারাবাহিকতাকে স্পষ্ট করে তোলার চেয়ে সে জীবনের প্রচারই এখানে আতিশয্যে রূপায়িত হয়েছে। 'বিস্ময়ের প্রতিমূর্তি' সব্যসাচী কাহিনীর পরিসরে ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর, কিন্তু এর বাইরের সামগ্রিক চরিত্রটি অন্ধকারে আবৃত না হলেও অনেকখানি অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন।

রামদাস তলোয়ারকরের মত দেশপ্রেমে ও বিপ্লবী সম্ভাবনায় উজ্জ্বল একটি চরিত্র স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠেই কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

রাজনৈতিক উপন্যাস–কাহিনীর অনিবার্য ধারার মধ্যে তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুমিত্রা ও সব্যসাচীর মাঝখানে এককালের সন্ত্রাসী কর্মসহচর ব্রজেন্দ্রের হঠাৎ ভিলেনের ভূমিকা নিয়ে সব্যসাচীর প্রাণের হুমকি হয়ে দাঁড়ানো এর মধ্যেকার ঘটনা–পারম্পর্য সঠিকভাবে প্রদর্শিত হয়নি।

তাছাড়া রয়েছে এর ঘটনা–বিন্যাসের বিষয়। "ভারতীয় সন্ত্রাসবাদ যে ব্রহ্মদেশ, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, জাপান পর্যন্ত জাল বিস্তার করিয়াছিল তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ'[৮] আছে। সেই ঐতিহাসিক সত্যকেই শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের চাহিদার খাতিরে ভারতের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ সন্ত্রাসবাদী কর্মজালের এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও লেখক নিস্পৃহতা প্রদর্শন করেছেন।

শরৎ–নজরুলের ঔপন্যাসিক শিল্পকর্মরূপকে এক পর্যায়ে ফেলে বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরং কালগত পরিপ্রেক্ষিতে মানস–গঠন প্রাপ্ত দু'জন শিল্পস্রষ্টার দুটি উপন্যাসের বিষয় বিন্যাসগত, চরিত্র নির্মাণগত সর্বোপরি বক্তব্য উপস্থাপনগত সঙ্গতি বিচারই এর লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে প্রথমে বিবেচ্য নজরুল–চেতনার উৎসভূমি।

'১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত প্রথম খেলাফত সম্মেলনে মাওলানা আজাদের অসহযোগ এবং মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ প্রস্তাব গৃহীত হয়। বোম্বাই খেলাফত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে খেলাফত ডেপুটেশন ইংল্যান্ডে প্রেরিত হয়, প্রতিনিধি দল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২রা মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ–এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন,[৯] মুসলিম ধর্মস্থান ও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা–বিষয়ক কতিপয় দাবী পেশ করেন, কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কোলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশব্যাপী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন একযোগে চলতে থাকে,[১০] বিক্ষোভ, ধরপাকড়, গুলী ও নির্যাতন যখন তুঙ্গে, গান্ধীজী তখন আকস্মিকভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করে চরকা কাটার উপদেশ দেন। উপলক্ষ, পূর্বে উল্লিখিত চৌরিচৌরা থানার এবং অন্যান্য সহিংস ঘটনা। 'অথচ

দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিদ্যমান। ফলে সারাদেশে বিক্ষোভ আর অবসাদ নেমে এলো। যুব-মনকে আচ্ছন্ন করলো হতাশা ও নৈরাশ্য আর তথাকথিত বুর্জোয়া নেতৃত্বে অবিশ্বাস।'[১১]

নজরুলের উপন্যাস সৃষ্টির যুগ এ অবিশ্বাস আর নৈরাজ্যিক অস্থিরতার কাল-সংলগ্ন, অর্থাৎ ১৯২১ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যবর্তী সময়ে। রাজনীতিক অঙ্গনের মত বাংলা সাহিত্যেও তখন এক ধারা বদলের যুগ। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি—যার অনিবার্য ফল বেকারত্বের সংকট ও হতাশার কণ্ঠলতা, কার্ল মার্ক্সের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও রুশ বিপ্লবের সাফল্য, ফ্রয়েডের মনোবিকলনতত্ত্ব, সমকালীন বিদেশী সাহিত্যের অভিঘাতে গণমানসে বিশেষতঃ তরুণমনে চাঞ্চল্য সব মিলিয়ে এক অভিনব পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সেখানে প্রচলিত মূল্যবোধের পরিবর্তে স্বীকৃতি পাচ্ছিল ব্যক্তি বিচারে নতুন মূল্যায়ন, দেহবাদ, সমাজের নীচুতলার অধিবাসী খেটে-খাওয়া মানুষ। রূপান্তরের এ কালকে আশ্রয় করেই নজরুল-প্রতিভা হয়েছে বিকশিত ও পরিণত। খেলাফত-অসহযোগের হিন্দু-মুসলিম মিলনের পরিচয় তাই তাঁর চেতনায়, শিল্পদেহের ভাঁজে ভাঁজে প্রেমে দেহনির্ভরতা, ধর্মবোধে অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্যবাদ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের হুঙ্কার। নজরুল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেনঃ

"নজরুল রবীন্দ্র-যুগেই রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করে একটা স্বতন্ত্র যুগের সূচনা করেছিলেন। এ যুগ বাংলাদেশের তথা অবিভক্ত ভারতের মানস চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার যুগ।"[১২] নজরুল উপন্যাসে এই সংক্ষোভময় যুগের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন সাধারণ মানুষের চেতনা জাগ্রত না হলে দেশ স্বাধীন হবে না, মানুষের ক্ষুধারও অবসান হবে না।

নজরুলের তিনটি উপন্যাসের নায়কেরা সবাই একই আদর্শের বাহক। তারা সবাই বিপ্লবী, নিজেকে সমর্পণ করেছে 'বিপ্লব বহ্নির করাল কবলে', ঘরছাড়া প্রেমের বাঁধন ছিঁড়ে দূর-দূরান্তে হারিয়ে যাওয়া বোহেমিয়ান চরিত্র। এদের কারো পরিণতি দ্বীপান্তরে, কারো বা ক্ষয়রোগাক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রায়। এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে বিষয়-বিন্যাসগত, চরিত্র সৃষ্টিগত, অবয়ব সংগঠনগত, বিদগ্ধ রস পরিবেশন নৈপুণ্যগত দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বে সমাসীন

'মৃত্যুক্ষুধা'। উপন্যাসে নজরুলের চিন্তাচেতনা ও মনীষা তুলনামূলকভাবে অধিক পরিপক্কতা নিয়ে উপস্থিত এই 'মৃত্যুক্ষুধা'য়।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের কাহিনী কৃষ্ণনগরে চাঁদ সড়ক নামে মুসলিম ও কনভার্ট খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকা আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এখানকার পুরুষেরা করে খানসামা, রাজমিস্ত্রি ও বাবুর্চির কাজ, আর স্ত্রীলোকেরা 'ধান ভানে, ঘরগেরস্থালির কাজকর্ম করে, রাঁধে, কাঁদে[১৩]' ঝগড়াঝাটিতে পাড়া সরগরম করে এবং নিরন্ন সংসারের ক্ষুধার্ত শিশুগুলোকে সামলায়। প্যাঁকালের মায়ের এমনি একটি সংসার। সেখানে আহারের অনেকগুলো মুখ, 'গোদের উপর বিষ ফোঁড়া'র মত স্বামী পরিত্যক্তা আসন্নপ্রসবা কন্যা। মৃত্যু আর ক্ষুধার দুর্বিষহ জ্বালায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে প্যাঁকালে, মেজো বউ। প্রায়শ্চিত্তের নামে প্যাঁকালের মায়ের শেষ সম্বল খসিয়ে নিয়ে ফায়দা লোটেন পাড়ার মৌলবী সাহেব। খেলাফত আন্দোলনের কর্মী আনসারের চেতনায় ধরা পড়ে কোন্ অদৃশ্য অঙ্গুলী সঞ্চালনে আর্থ-সমাজ-ধর্মের এই দশা। পরবর্তী পর্যায়ে তার দেশপ্রেম, কারাবরণ ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি লাভ।

ক্ষুধা, মৃত্যু আর অবগুণ্ঠিত মানবাত্মার আর্তনাদে আক্রান্ত-বিক্ষত এক সমাজ জীবনচিত্রকে আশ্রয় করে কাহিনী শুরু হলেও নজরুল একে প্রবাহিত করেছেন ভিন্ন খাতে। সেখানে প্রাধান্য নিয়ে অবস্থান করছে আনসারের মত একজন বিপ্লবী সমাজকর্মী। প্রথম জীবনে যে ছিল গান্ধীজীর অসহযোগ ও চরকা নীতির সমর্থক, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে চিন্তা-চেতনায় আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে খেলাফত আন্দোলনকে। আপাতঃদৃষ্টিতে উপন্যাসের কাহিনীকে দ্বিধা বিভক্ত মনে হলেও অন্তঃগূঢ় অভিন্নতায় এটি সূত্রবদ্ধ।

ইংরেজ শাসনের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে গিয়ে উপন্যাসের প্রথমে নজরুল তুলে ধরেছেন অর্থনৈতিক সংকটময় জীবনের এক চালচিত্র। 'মৃত্যুক্ষুধা'য় যে বাস্তবচিত্র আছে— বিশেষতঃ প্যাঁকালের সংসারের চিত্র— তা সেকালের রচনায় সুলভ ছিল না। একদিকে ইংরেজ শাসনের নিষ্পেষণে দেশের মধ্যে তৈরি হচ্ছে নিদারুণ অভাবগ্রস্ত এক একটি নিরন্ন শ্রেণী, অন্যদিকে এদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করে চলেছে খ্রিস্টান মিশনারীরা; বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে তাদেরকে স্ব-ধর্ম ও স্ব-সমাজ থেকে। আর সামসময়িক প্রেক্ষাপটের অর্থনৈতিক কাঠামোয় গড়ে ওঠা সমাজধর্ম থাকছে নির্বিকার উদাসীন। ফলে মৃত্যু আর ক্ষুধার কুক্ষিগত এ দুর্বিষহ জীবন থেকে

অব্যাহতি লাভের জন্য বিত্তবিহীন মানুষ, মানুষের লাঞ্ছিত আত্মা উপায়বিহীন অক্ষমতায় মাথা পেতে দিচ্ছে ওদেরই সর্বনাশা হাতের নীচে। সামাজিক এ অবস্থার পরিবর্তন ও লাঞ্ছিত মানবাত্মার মুক্তি আনয়ন করতে হলে প্রথমে চাই দেশের স্বাধীনতা। আর তার জন্য প্রয়োজন বিপ্লব, বিপ্লবের একনিষ্ঠ কর্মী। আনসার চরিত্র এখানে নজরুলের এ বক্তব্যেরই বাহক।

ব্রিটিশ শাসকের অনুসৃত শিল্প ও বাণিজ্য নীতি দেশের উৎপাদন এবং শ্রমিক স্বার্থের বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। তার অনিবার্য ফল— শ্রমিক চেতনার জাগরণ। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলন যখন একই সঙ্গে সক্রিয়, ভারতের শ্রমিক শক্তির অভ্যুদয় তখন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তাই শ্রমিক আন্দোলনকেও জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পত্তন হল। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের নায়ক আনসারকে উপলব্ধি করতে দেখি এই শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণের যৌক্তিকতার কথা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে তাই সে এক একটি শ্রমিক সংঘ গড়ে তুলেছে। শ্রমিক শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে না পারলে দেশের স্বাধীনতার আশা অসম্ভব। শ্রেণী চেতনাসম্পন্ন, সাহসী ও সংগ্রামী এই শ্রমিক শ্রেণীই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। এদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে যথার্থ বৈপ্লবিক শক্তির আয়োজন। অথচ নিদারুণ শোষণ বঞ্চনার শিকার এরাই। তাই এদের উজ্জীবিত করে তুলে শোষক শিল্পপতি সম্প্রদায়ের স্বার্থের মূলে আঘাত হানতে হবে। এ উপলব্ধি, এ বিপ্লবী বিশিষ্টতার কারণেই আনসার চরিত্রের স্রষ্টা নজরুল স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। আর এ জন্যই 'কল্লোল গোষ্ঠী'র একজন হয়েও তাদের ভাববাদী বিপ্লবের গণ্ডী অতিক্রম করে তিনি আশ্রয় করেছিলেন মার্ক্সীয় বস্তুবাদী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্যকে। সে পরিবর্তনে রয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতির দিক। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের গোটা অবয়বে এরই প্রকাশ ঘটেছে। তাই আপতঃবিচ্ছিন্নতা থাকলেও দুটি অংশের মধ্যে রয়েছে এক অন্তর্গূঢ় যোগসূত্র। এ যোগসূত্র কেবল মেজো বউ–চরিত্রের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ছিল না।

দেশকালের পরিস্থিতি নজরুল–মানসকে যেভাবে আক্রান্ত করেছিল, তারই ফল তাঁর এখানকার ঔপন্যাসিক বক্তব্য, বিষণ্ন–বিচলিত বিক্ষুব্ধ–অশান্ত নায়ক চরিত্রের অবয়ব সংগঠন। ফরসা রঙ ও নাক মুখের গড়নে 'গ্রীক ভাস্করের এ্যাপোলো মূর্তির মত' (পৃ ৫০৭) আনসারকে তাই দেখি

খদ্দরধারী, খেলাফতী ভলান্টিয়ারের পোশাক পরিহিত, ক্ষৌরকর্মহীন মুখ এবং গোটা অবয়বে অবহেলা আর অযত্নের ছাপ নিয়ে উপস্থিত হতে। অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য সত্ত্বেও কোটি কোটি নিরন্ন নর-নারীর বিষণ্নতা তার অন্তরতলে ফল্গুর মত বয়ে যায়। ওদের জাগিয়ে দিয়ে ওদের দ্বারাই সে অবস্থার পরিবর্তন আনতে চায়।

এখানে আনসার চরিত্রের দুটি দিক— এক দিকে কৌতুকপ্রিয়তা, হাস্যোচ্ছলতা ও জীবনানন্দময়তা; অন্যদিকে আপনজনদের আকর্ষণ ছিন্ন করে বিপ্লবের দুর্ভর পথে পদচারণার সুকঠিন আয়োজন। একটি অন্যটির পরিপূরক। তার সংগ্রামী চেতনা ও সমাজভাবনার সঙ্গে জীবনবোধের নিবিড় মিল ঘটেছে বলেই সে ঘরছাড়া পথিক। দেশ ও জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সর্বপ্রকার আসক্তি বিবর্জিত। আনসার নজরুল-সত্তারই জীবন্ত প্রতিনিধি।

অশিক্ষিত মেজো বউ রাজনীতি বোঝে না, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত অন্তরে অনুভব করে সমাজ-ধর্মের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য। তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্ফুরিত হয় তার কণ্ঠে। সে বলে: "শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে: ঝ্যাঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াত কুটুমের মুখে! সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়! (পৃ. ৪৯০) সে অনুভব করে- "আলো বাতাস, প্রাণের বড় অভাব আমাদের সমাজে, তাই খাঁচার পাখার মত শিকলি কেটে বেরিয়ে" (পৃ. ৫৪৫) পড়ে সে। মেম সাহেব হতে নয়, মানুষ হ'বার বাসনায়। সে বুঝেছিল—অর্থ সংকট নিরসন-প্রয়াসের পাশাপাশি লেখা-পড়া শেখার মাধ্যমেই তা সম্ভব। জীবনাপিপাসু, প্রাণচঞ্চল যুবতী মেজো বউ। সে অভাবের যন্ত্রণা বোঝে, যন্ত্রণা নিরসনের পথও খোঁজে। আর তা খুঁজতে গিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে হয় তাকে। মুক্তি পিয়াসী মেজো বউয়ের কাছে আজন্ম অভ্যস্ত ধর্ম সংস্কারের বাধা বড় হয়ে দাঁড়ায়নি। মৌলবী শাসিত নিরক্ষর গ্রাম্য সমাজের নিভৃত কোণে অবস্থান সত্ত্বেও এক প্রাগ্রসর জীবনবোধ ও সংস্কার মুক্তি তার চরিত্রকে বিশেষত্ব দান করেছে। তার চারপাশে অবস্থানরত নিরেট জীবনধর্মের অধিকারী চরিত্রগুলোর পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে যেন এই মেজো বউ।

উপন্যাস-শিল্পের বিচারে ততটা না হলেও আনসার ও মেজো বউ এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র, যেহেতু তারা কোন না কোনভাবে বিদ্রোহী। দেশ ও সমাজের সহজ হাওয়া বিষিয়ে তোলা অপশক্তির বিরুদ্ধে নবজাগ্রত আত্মার প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে এই চরিত্রদ্বয়ের মধ্য দিয়ে।

গোটা উপন্যাসটি ক্ষুধা, যন্ত্রণা আর সুখী–স্বচ্ছল সংসার জীবন থেকে স্বেচ্ছা–নির্বাসিত বিপ্লবীদের ত্যাগের সাক্ষী বহন করলেও নজরুলের কাব্যিক গুণ ও হাস্যরসশিল্পের প্রাচুর্য এর পরতে পরতে। যুগের আবহে তাঁর কিছু কিছু হাস্যরস এখানে রাজনৈতিক উপযোগিতা অর্জন করেছে:

ক. গজালের মা'র পাড়াতে কুঁদুলী বলে বেশ নাম ডাক আছে। সে–ই 'অপজিশন লীড' করছে মুসলমানদের তরফ থেকে। (পৃ.৪৬২)

খ. যত গালি তার জানা ছিল ভব্য, অভব্য, শ্লীল, অশ্লীল সবগুলো একবার দু'বার বারবার উচ্চারণ করে তার যেন আর খেদ মেটে না! 'লুইসগানার' যেন মিনিটে সাতশ' করে গুলী ছুঁড়ছে। (পৃ. ৪৬৪)

গ. কাল থেকে চালের হাঁড়িতে ইঁদুরদের দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা বসেছে। তাদের কিচির মিচির আর নেংটে ভলান্টিয়ারদের হুটোপাটির চোটে সারারাত তার ঘুম হয়নি। (পৃ. ৪৬৯)

ঘ. থানায় গিয়ে মার্চ করে যখন পেলে এই খেলনার রিভলভারটা, তখন তাদের মুখের যা অবস্থা হয়েছিল রে বুঁচি, তা ঠিক বলে বুঝাতে পারব না। গোবর থাকলে ছাঁচ তুলে নিতাম। (পৃ. ৫১১)

লেখকের জীবনদর্শন এখানে রূপলাভ করেছে আনসারের ভূমিকা ও বক্তব্যে: 'সুতোয় কাপড় হয় দেশ স্বাধীন হয় না। .... আর সব দেশ মাথা কেটে স্বাধীন হতে পারছে না, আর এদেশ কি সুতো কেটে স্বাধীন হবে?' (পৃ. ৫১২–৫১৩)

শরৎ–নজরুলের জীবনদর্শনগত অভিন্নতা এখানে লক্ষণীয়।

যদিও 'দেশকালের অগ্নিদহন, তদহেতু মানসিক অশান্তি ও নিষ্ঠার অভাব সৎ উপন্যাস রচনায় নজরুলের ব্রত বিঘ্নিত হয়েছে'[১৪] তবু একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, বাস্তবদৃষ্টি, সংবেদনশীলতা, চরিত্র–[illegible] প্রয়াস, ভাষাজ্ঞান প্রভৃতি উপকরণ সমাবেশ 'মৃত্যুক্ষুধা'কে সার্থক উপন্যাসের উপযোগিতা দান করেছে অনেকখানি।

তাছাড়া রয়েছে দুই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও তার প্রকাশগত সঙ্গতি। ''পথের দাবী''র সব্যসাচী সহিংস বিপ্লবী কর্মী, ''মৃত্যুক্ষুধা''র আনসার ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীরূপে উপন্যাসে উপস্থিত হলেও তার অতীত ইতিহাসের

ইঙ্গিতে বিপ্লবী কর্মী ভূমিকাই স্পষ্টতা লাভ করেছে। উভয় নায়কের মত ও কার্যাবলীর মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও বিপ্লবের পথ–পর্যটনে দুজনেই গান্ধীজীর বিপরীত মত ও পথের অনুসারী। দুজনেরই হাস্যরসপ্রবণতা ও হাতের মুঠির শক্তির অভিন্নতা অনস্বীকার্য। ''পথের দাবী''র লেখক অভাবের যাতনায় ধুঁকে–মরা বস্তিবাসী নিম্নবিত্তের জীবনযাত্রা চিত্রায়ণে যে বাস্তবতা প্রদর্শন করেছেন, ''মৃত্যুক্ষুধা''র স্রষ্টাও তার ব্যতিক্রম নন। সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার শিকার এই দুর্গত মানুষগুলোর সম্পর্কে লেখকদ্বয়ের অভিমতও সংগতিপূর্ণ। ''পথের দাবী''র ভারতী বলে:

> ''এ নরককুণ্ড ত এরা বানায়নি, এরা শুধু তার প্রায়শ্চিত্ত করছে'' (পৃ. ১৮৯)

–আর ''মৃত্যুক্ষুধা''র মেজো বউকে বলতে শুনি:

> ''আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রীষ্টান করেছেন।'' (পৃ. ৫২৪)

প্রেমের অমৃতস্পর্শলাভ করেও একে নির্বিকার ঔদাস্যে দূরে সরিয়ে রেখেছে উভয় উপন্যাসের নায়ক। দেশমাতৃকার মুক্তিকামনায় জীবনকে উৎসর্গ করতে বদ্ধপরিকর তারা দুজনেই। আর তাদের উদাসীনতার কারণে অন্তর্গত দহনে হৃদয় পুড়িয়ে নিঃস্ব হয়েছে সুমিত্রা ও রুবি। আদর্শ ও ভূমিকাগত পার্থক্য সত্ত্বেও তারা প্রেমিকের প্রতি অভিমানে ও অভিযোগে সাযুজ্য লাভ করেছে এ দুটি উপন্যাসে।

সব্যসাচী ইংরেজদের সম্পর্কে অন্তরের পুঞ্জীভূত ঘৃণা প্রকাশ করে বলেছে: ''একরকমের সাপ আছে-----তারা সাপ খেয়েই জীবন ধারণ করে।-----পাশাপাশি বাস করাটা ঠিক ঘটে ওঠে না বটে, কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠভাবে একজনের জঠরের মধ্যে আর একজন বেশ নিরাপদই স্থান পায়।'' (পৃ. ১২৩৮) আনসার বলেছে: ''(ইংরেজ) পশু হয়েও পশুরাজ স্পেসিসের। আধমরা রোগজীর্ণ শিকার এরা খায় না। · · · আবার পুরুষ্টু হয়ে উঠলেই ক্যাঁক করে ধরবে।'' (পৃ. ৫৫৬) সব্যসাচী ও আনসার উভয়েই উপলব্ধি করেছে শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণের যৌক্তিকতার কথা।

উভয় ঔপন্যাসিকের বিপ্লবীচেতনা–নির্ভর অন্তর–সঙ্গতির সাক্ষ্যই বহন করছে উল্লিখিত বিষয়গুলো। একজনের সৃষ্টিতে রয়েছে আপসহীন বিপ্লবের আয়োজন, অন্যজনের রয়েছে শ্রমিক, নিম্নস্তরবাসী, সাধারণ মানুষকে

জাগানোর শিল্পরূপ সৃজন-প্রয়াস। বিপ্লব আন্দোলনের কাললগ্নতায় স্বদেশমুক্তির কামনাই ঘোষিত হয়েছে উভয় উপন্যাসের পরিসরে।

তথ্য –নির্দেশ

১ সৈয়দ আকরম হোসেন: ''নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ: চেতনা প্রবাহ ও শিল্পমান,'' ''বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'' (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃ. ৭৬–৭৭

২ নীলিমা ইব্রাহিম: ''শরৎ প্রতিভা' (চতুর্থ সংস্করণ; ঢাকা, ১৩৮০), পৃ. ২৮১

৩ ঐ, পৃ. ১৮

৪ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: ''পথের দাবী'' ''শরৎ সাহিত্য সমগ্র' (কলকাতা,১৩৯২) পৃ. ১২৩৮। ''পথের দাবী'র অন্যান্য উদ্ধৃতির পরে নির্দেশিত পৃষ্ঠাসংখ্যা এই সংস্করণের।

৫ শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়: ''শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন', পৃ. ৫৪–৫৫; রশীদ আল ফারুকী: ''শরৎ সাহিত্য জিজ্ঞাসা' (দ্বিতীয় সংস্করণ; ঢাকা, ১৩৮৫), পৃঃ ১৯৮–এ উদ্ধৃত।

৬ শৈলেশ দে: আমি সুভাষ বলছি, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৩৭৫) পৃ ২৮৬

৭ ঐ, পৃ. ১৮৬

৮ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (ষষ্ঠ সংস্করণ; কলিকাতা, ১৩৮০), পৃ. ২৭৩

৯ রফিকুল ইসলাম: নজরুল–জীবনী (ঢাকা, ১৯৭২) পৃ. ১২৫

১০ ঐ, পৃ. ১২৬

১১ সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত পৃ. ৭৭

১২ মুহম্মদ আবদুল হাই: ''উপন্যাস রচনায় নজরুল,'' পাকিস্তান পাবলিকেশনস্, নজরুল পরিচিতি, (ঢাকা, ১৯৬২), পৃ ১৪

১৩ কাজী নজরুল ইসলাম: 'মৃত্যুক্ষুধা', ''নজরুল রচনাবলী,'' ২য় খণ্ড (ঢাকা, ১৯৬৭), পৃ. ৪৬১; 'মৃত্যুক্ষুধা'র অন্যান্য উদ্ধৃতির পরে নির্দেশিত পৃষ্ঠা সংখ্যা এই সংস্করণের।

১৪ সাইদুর রহমান ভুঁইয়া: ''নজরুল ইসলামের উপন্যাস'' 'সাহিত্য পত্রিকা'. উনত্রিংশ বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩৯২), পৃ ৪৩